# মায়ানগরী আঁধারলোক

## মুম্বই অন্ধকার দুনিয়ার ইতিবৃত্ত

সোমজা দাস

অরণ্যমন প্রকাশনী

# ভূমিকা

প্রতিটি লেখার একটা গল্প থাকে। লেখাটি পাঠকের দরবারে পৌঁছয়। হয়তো গৃহীত হয়, নয়তো ত্যক্ত। কিন্তু লেখার পেছনের গল্পটুকু লেখকের একান্ত নিজস্ব। কেউ জানতে চায় না এই লেখাটির অনুপ্রেরণা কোথা থেকে; লেখার সময় লেখক কত নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে; প্রতিটি অধ্যায় লেখার আগে ঠিক কতটা পড়াশোনা করতে হয়েছে; তাকে নিয়ে লেখকের ঠিক কতটা আবেগ রয়েছে; তথ্য খোঁজার জন্য কোথায় কোথায় ঘুরতে হয়েছে, হাতড়ে বেড়াতে হয়েছে অন্তর্জাল ও বিভিন্ন গ্রন্থের অলিতে-গলিতে। কেউ খবর রাখে না, এই একটা বইয়ের জন্য কত বই জমে উঠেছে লেখকের পড়ার টেবিলে! কিন্তু বইয়ের আখরগুলি যতটা সত্য, ঠিক ততটাই সত্য এর পেছনে লুকিয়ে থাকা গল্পগুলো। সেটাই বলতে বসলাম।

গত বছরের গোড়ার দিকে এই বিষয়টা নিয়ে পড়তে শুরু করেছিলাম। ইন্টারনেট ঘেঁটে পড়তাম। বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল ঘেঁটে তথ্য জোগাড় করছিলাম। যতই বিষয়টার ভেতরে ঢুকছিলাম, ততই যেন চুম্বকের মতো আমায় টানছিল বিষয়টি। মনে হল, আরও পড়ি। বই খুঁজতে গিয়ে দেখি, ইংরেজি ও হিন্দিতে এই বিষয়ের ওপর বেশ কিছু বই থাকলেও বাংলায় সেই সংখ্যা সীমিত। সেই মুহূর্তেই কথাটা মাথায় এল। বোম্বাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ডের গল্প বাংলায় লিখলে কেমন হয়!

ভাবনার প্রথম ধাপ ছিল পড়া। সেই সময় আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল লেখক, প্রাবন্ধিক সুপর্ণা চ্যাটার্জি ঘোষাল। প্রাথমিক কিছু বইয়ের কপির জোগানদার সে-ই। এতদিন পড়েছি ছাড়া-ছাড়া ভাবে। এবার সিরিয়াস পড়াশোনা শুরু করলাম। অনলাইনে অর্ডার দিয়ে একের পর এক বই আনাতে শুরু করলাম। যত বিষয়টার ভেতরে ঢুকছিলাম, ততই যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু কিছুতেই সমুদ্রের তলদেশ ছুঁতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, এমন কারও মুখে শুনতে পেলে ভালো হত। সেই সময়ে অন্তর্জালে খোঁজ পাই প্রাক্তন সাংবাদিক বলজিত পরমারের, যাঁর ওপর ছোটা রাজনের দলের লোকেরা গুলি চালিয়েছিল একসময়ে। ইউটিউবে নিজের পেশাগত জীবনের নানান অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তিনি। সেইসব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা শুনতে শুনতে আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম, সত্যিই বাস্তব কল্পনার চেয়েও চমকপ্রদ। এই বইটি লেখার পেছনে বলজিত পরমারের অবদান অনস্বীকার্য।

ইংরেজিতে মুম্বই আন্ডারওয়ার্ল্ডের ওপরে যাঁরা লিখেছেন ও লিখে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম নাম আসে এস হুসেইন জাইদির। তাঁর চেয়ে বেশি বিস্তারে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই বিষয়ে কেউ লিখেছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। তাই 'মায়ানগরী আঁধারলোক' সম্পর্কে লিখতে গেলে হুসেইন জাইদিকে বাদ দিয়ে লেখা সম্ভব নয়। এই বই আসলে ওপরোক্ত দুই বর্ষীয়ান সাংবাদিকের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এই বই লিখতে বসে যেখানেই আটকেছি, নির্দ্বিধায় ফোন করেছি প্রাবন্ধিক কাজল ভট্টাচার্য, আমাদের প্রিয় কাজলদাকে। তিনিও আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন সবসময়ে। প্রয়োজনীয় বইয়ের নাম জানানো থেকে কোথা থেকে কোন বিষয়ে না-জানা তথ্য বের করে আনা যাবে, সবই জানিয়েছেন। শুনিয়েছেন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও। উৎসাহ দিয়েছেন সর্বদা। অতি-উৎসাহ থেকেও বিরত করেছেন অভিভাবকসুলভ স্নেহে। সাহায্য পেয়েছি বিশিষ্ট লেখক অভীক মুখোপাধ্যায়ের কাছেও। সুপর্ণা, কাজলদা, অভীক সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আর কৃতজ্ঞতা জানাই অনির্বাণকে। আন্ডারওয়ার্ল্ড নিয়ে পড়তে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে বিস্মিত হতাম। আমার যাবতীয় অর্জিত জ্ঞান, বিস্ময় মেলে ধরতাম ওর সামনে। বিষয়টি সম্পর্কে সেভাবে কিছু না জেনেও ধৈর্য ধরে শুনেছে আমার প্রতিটি কথা। পরামর্শ দিয়েছে।

ধন্যবাদ অরণ্যমন প্রকাশনী ও তার কর্ণধার ভ্রাতৃপ্রতিম চিরঞ্জীতকে। বইটি লেখার ব্যাপারে তার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি সব সময়ে। লেখা শুরু করার আগেই আমার পরিকল্পনা শুনেই সে বইটি প্রকাশ করবে বলে জানিয়েছিল। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা তাকে, আমার ওপর ভরসা রাখার জন্য।

এই বইটিকে আমি কোনো সময়সীমায় বাঁধতে চাইনি। মোটামুটি বোম্বেতে আন্ডারওয়ার্ল্ডের অভ্যুত্থান থেকে শুরু করেছি কাহিনি। তবে দাউদ দুবাই ছেড়ে করাচি চলে যাওয়ার পরের অংশ ইচ্ছে করেই উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি। তার কারণ মূলত দুটি। পাকিস্থান সরকার কখনওই অফিশিয়ালি এর সত্যতা স্বীকার করেনি। কারণ সে-দেশে মূল্যের পরিবর্তে নাগরিকত্ব দেওয়ার চল নেই। কিন্তু আইনের বিপরীতমুখে হেঁটে দাউদের ক্ষেত্রে সেই কাজটাই করেছে পাক সরকার। উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন নয়। এক, দাউদের প্রভূত অর্থকে ব্যবহার করা। দুই, তার মতো ক্ষমতাশালী ডনের বন্ধুত্ব তথা ক্ষমতার শরিক হওয়া।

দ্বিতীয়ত, করাচি যাওয়ার পর থেকে বোম্বে তথা ভারতবর্ষে দাউদের প্রভাব কিছুটা কমে এসেছিল। তবে যদি পাঠক ভেবে থাকেন যে, দাউদ ভারতে সব ব্যাবসা থেকে হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে আছে, তবে ভুল ভাবা হবে। দাউদ দুবাই চলে যাওয়ার পরেও প্রথমে ছোটা রাজন, পরে শাকিল ও

দাউদের বোন হাসিনা পার্কার প্রমুখ এ-দেশে দাউদের ব্যাবসা নিয়ন্ত্রণ করত। হাসিনা মারা যায় ২০১৪ সালে। ছোটা শাকিলের মৃত্যু সম্পর্কে একটা খবর হাওয়ায় ভেসেছে বটে, তবে সেই সংবাদকে দাউদ বা শাকিলের পরিবার বা দলের লোকেরা নিজেদের তরফ থেকে স্বীকৃতি দেয়নি। শাকিলের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কোনো খবর পাওয়া যায় না।

এই বইয়ে আমি অধিকাংশ স্থানে 'বোম্বাই' বা 'বোম্বে' লিখেছি 'মুম্বই'-এর পরিবর্তে। কারণ এই বইয়ের পরিসরে যখনকার কাহিনি আমি শুনিয়েছি, তখনও বোম্বে 'মুম্বই' হয়নি। আবার নয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে যা যা ঘটনার উল্লেখ করেছি, সেখানে 'মুম্বই' লিখেছি।

এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে আন্ডারওয়ার্ল্ডে ব্যবহৃত শব্দাবলির একটা তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করেছি। আশা করি, যেসব পাঠকেরা আরও বেশি জানতে চান আন্ডারওয়ার্ল্ড নিয়ে, তাদের এতে করে সুবিধে হবে। বইটি লিখতে বসে কল্পনার আশ্রয় নিতে চাইনি। পড়তে গিয়ে যেসব ঘটনার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ জেগেছে, সেগুলি সযত্নে পরিহার করেছি অথবা উল্লেখ করে দিয়েছি আমার সন্দেহের কথা। সেই অর্থে আমি এই বইয়ের লেখক নই, সংকলক মাত্র। কারণ এই বইয়ে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাই দিনের আলোর মতো সত্য। বাস্তব। আমি শুধু টাইম-মেশিনে চড়িয়ে পাঠককে সেই দিনগুলিতে ঘুরিয়ে আনতে চেয়েছি যখন মায়ানগরীর বুকে গ্যাং-ওয়ার, খুনজখম ছিল খুব সাধারণ ঘটনা। এই বইয়ে উল্লিখিত একজন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনিও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। একসময় তিনি খুব কাছ থেকে বোম্বাইয়ের এই অপরাধ জগৎকে দেখেছেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর নাম উহ্য রাখলাম।

সেই কারণেই বলছি, আমি শুধু পরিবেশক। নানান সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করে দুই মলাটের মধ্যে সাজিয়ে পরিবেশন করেছি। তবে সেই তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে আমার শ্রম ও একনিষ্ঠতা ছিল একশো শতাংশ সত্য, এই বইয়ের তথ্যের মতোই। রাতের পর রাত জেগেছি। যেখান থেকে যা তথ্য পেয়েছি, নোট রেখে এগিয়ে গেছি। অন্য সূত্র থেকে একই বিষয়ে তথ্য পেলে মিলিয়ে দেখে নিয়েছি। শুধু সেটুকুই লিখেছি যেসব ক্ষেত্রে সব সূত্র থেকেই একই তথ্য পেয়েছি। অর্থাৎ তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

দীর্ঘ সময় ধরে টানা পরিশ্রমের ফসল এই বই। যত লিখেছি, অনুক্ত রয়ে গেছে তার কয়েক গুণ। তাই বইয়ের শেষে তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছি। আগ্রহী পাঠকেরা চাইলে এই বিষয়ে আরও জানতে পারেন। আরও অনেক সূত্র উল্লেখ করতে পারিনি। দোষটা আমারই। ইন্টারনেট ঘেঁটে পুরোনো প্রতিবেদন টানা পড়ে যাওয়ার সময়ে কিছু ক্ষেত্রে তাড়াহুড়োয় তার লিংক

লিখে রাখতে ভুলে গেছি। তবু চেষ্টা করেছি যাতে তথ্যের অপলাপ না হয়। জানি না কতদূর সফল হয়েছি। তবে চেষ্টা করেছি। বাকিটা পাঠকের হাতে ছাড়লাম।

পাঠ শুভ হোক।

অলমিতি।

সোমজা দাস
২০ অক্টোবর, ২০২৩
কৈখালি, কলকাতা

## .. সূচিপত্র ..


প্রথম অধ্যায়: মাফিয়া-রাজের গোড়াপত্তন ১৯

১. স্বপ্নের (না কি দুঃস্বপ্নের) সূচনা ২১
২. মাস্তানের উত্থান ২৩
৩. 'দয়াবান' বরদারাজন ২৮
৪. করিম লালা ও পাঠান গ্যাং ৩৪
৫. ইয়ারি হ্যায় ইমান মেরা ৪০
৬. পালোয়ান বাসুদাদা ৪৫
৭. আল্লাহর বান্দা ইব্রাহিম কস্কর ৪৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: বোম্বে মাফিয়ার নতুন প্রজন্ম ৫১

১. পশ্চিমে মেঘ ঘনাল ৫৩
২. ঝড় আসছে ৫৭
৩. হিসেব বরাবর ৬০
৪. লোহায় লোহা কাটে ৬৪
৫. যুদ্ধে কিছুই অন্যায় নয়! ৬৯
৬. সময়ের খেল ৭২
৭. সাময়িক যুদ্ধবিরতি ৭৪
৮. রাজা বৃদ্ধ হলেন ৭৭
৯. প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে ৮০
১০. শান্তিচুক্তির ফলাফল: দাউদের ক্ষমতাবৃদ্ধি ৮২
১১. আবার রক্তপাত ৮৫
১২. মান্যিয়া সুরভে ৮৮
১৩. মান্যিয়া সুরভে এনকাউন্টার ৯২
১৪. এবার প্রতিশোধ ৯৫

১৫. সামাদ খান হত্যা ৯৯
১৬. আলমজেবের এনকাউন্টার ১০৪

তৃতীয় অধ্যায়: দুবাইয়ে দাউদ ১০৭

১. মরুশহরে পাতালরাজ ১০৯
২. প্রতিহিংসার নাম অরুণ গাওলি ১১৩
৩. প্রতিশোধ: জে জে হাসপাতাল শুট-আউট ১১৭
৪. লোখন্ডওয়ালা শুট-আউট: বোম্বে পুলিশের আরও এক সাফল্য ১২০
৫. ছোটা রাজন ১২৫
৬. রাজন জমানার সমাপ্তি ১২৯

চতুর্থ অধ্যায়: বোম্বাই বিস্ফোরণ ও পরবর্তী সংবাদ ১৩৩

১. দুবাইয়ে গোপন বৈঠক ১৩৫
২. টাইগার মেমন ১৩৮
৩. বিস্ফোরণের দিন ১৪১
৪. পুলিশি তদন্ত ১৪৬
৫. তদন্তের পরবর্তী অধ্যায় ১৪৯
৬. দাউদের প্রতিক্রিয়া ১৫৪
৭. অপারেশন দিল্লি দরবার ১৫৭

পঞ্চম অধ্যায়: মায়ানগরীর নারী মাফিয়ারা ১৬৫

১. জেনাবাই দারুওয়ালি ১৬৭
২. জেনাবাইয়ের উত্থান ১৭০
৩. গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি ১৭৩
৪. হাসিনা পার্কার ১৭৮
৫. আশরফ খান ওরফে সপনাদিদি ১৮৩
৬. প্রতিশোধের আর এক নাম সপনাদিদি ১৮৭
৭. লল্লনভাবি ১৯১
৮. অন্যান্য নারী মাফিয়ারা ১৯৩
৯. মাফিয়াদের স্ত্রী ও প্রেমিকারা ১৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায়: আন্ডারওয়ার্ল্ড ও বলিউড যোগ ২০৫

১. আশ্চর্য অপহরণ ২০৫
২. আন্ডারওয়ার্ল্ডের বলিউডে প্রবেশ ২১০
৩. ডন ও সুন্দরী ২১৪
৪. বলিউডের 'ব্যাড বয়' ২১৯
৫. মাফিয়া যখন প্রযোজক ২২১
৬. হ্যালো, ভাই কলিং ২২৪

সপ্তম অধ্যায়: আন্ডারওয়ার্ল্ডের আরও কিছু নাম ২২৭

অষ্টম অধ্যায়: আঁধারলোকের সাংকেতিক পরিভাষা ২৪১

# .. প্রথম অধ্যায় ..

## মাফিয়া-রাজের গোড়াপত্তন

### ।। এক ।।

### স্বপ্নের (না কি দুঃস্বপ্নের) সূচনা

মায়ানগরী মুম্বই। সারা দেশ থেকে প্রতিদিন কত মানুষ এ-শহরে আসে দু'চোখে স্বপ্ন নিয়ে। কারও চোখে থাকে রুপোলি পর্দার হাতছানি তো কেউ আসে স্রেফ দু'বেলা দু'মুঠো খেতে-পরতে পাওয়ার আশায়। এদের মধ্যে মাত্র দু'-চারজন এমন থাকে, যাদের বুকে আগুন জ্বলে। যাবতীয় অপ্রাপ্তি হতাশাকে ছুড়ে ফেলে যারা এই শহরকে জয় করতে চায়। আজ সেরকমই একজনের গল্প শোনাব।

পাঁচ-ছয়ের দশকে বোম্বের অপরাধ-জগৎ যাদের অঙ্গুলিহেলনে চলত, তাদের কেউই সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ বোম্বেতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এদের বেশিরভাগই ছিল স্থানীয় গুন্ডা। দল বানিয়ে অপরাধ করে বেড়াত। সংগঠিত অপরাধকে ইন্ডাস্ট্রি বানিয়ে ফেলার ধারণা সেই সময় কারও সুদূর কল্পনাতেও ছিল না।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন বোম্বে আজকের মুম্বই হয়ে ওঠেনি। দক্ষিণ বোম্বের জনসংখ্যা ছিল তখন মাত্র দুই লক্ষের আশেপাশে। অপরাধ বলতে ছিল চুরি বা ছিনতাই। বন্দুক-পিস্তল হাতে ওঠেনি তখনও। ছুরি-চাপাতি দিয়ে ভয় দেখিয়ে উদ্দেশ্য সাধন হয়ে যেত অনায়াসেই। মানুষের জীবন ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল।

সেই শুরুর দিনগুলিতে বোম্বাই শহরের বুকে যেসব গ্যাংগুলি জনমানসে বেশ ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, তার মধ্যে নান্নে খানের 'এলাহাবাদি গ্যাং'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। বাইকুলা থেকে নিজেদের কর্মকাণ্ড চালাত তারা। এদের প্রতিদ্বন্দী আবার ছিল জনি গ্যাং। তিন 'জনি' ভাই, পর্যায়ক্রমে বড়ো জনি, ছোটো জনি ও চিকনা জনি ছিল এই গ্যাং-এর শীর্ষে। এই দুই গ্যাং-এর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ লেগেই থাকত।

এরপর উঠে আসে কানপুরি ও রামপুরি গ্যাং, যদিও এদের আয়ু খুব বেশি ছিল না। এই রামপুরি গ্যাং একরকম ছোটো ধারালো চাকুর প্রচলন করে যেগুলি সহজেই ভাঁজ করে পকেটে বয়ে নিয়ে ঘোরা যেত। কালক্রমে এরই নাম হল রামপুরি চাকু। গ্যাং রইল না, কিন্তু অস্ত্রখানি রয়ে গেল। পঞ্চাশের

দশকের শেষ দিকে জনি গ্যাং-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসে ইব্রাহিমদাদার গ্যাং। এদের বৈরির মূল কারণ কিন্তু ছিল ধর্মীয়। ইব্রাহিমদাদার স্ত্রী ছিল একজন খ্রিস্টান মহিলা, যে বিয়ের পরে ইসলাম কবুল করেছিল। এই ব্যাপারটি জনি-ভাইরা মেনে নিতে পারেনি। সমস্যাটা শুরু হয়েছিল সেখান থেকেই।

জনি-ভাইরা এই বিয়েকে তাদের ব্যক্তিগত অসম্মান বলেই ধরল। শুরু হল লড়াই। ফলস্বরূপ, প্রাণ দিল বড়ো জনি; এরপর ছোটো জনি, চিকনা জনিও দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করল অচিরেই। তাদের অবশ্য ইব্রাহিম মারেনি। তবে অপরাধ জগতের অকথিত নিয়ম তো এটাই। হয় মারো, নয় মরো। রাতারাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল জনি গ্যাং।

এরপর কাশ্মিরী গ্যাং, জৌনপুরি গ্যাং, সঙ্গে আরও কিছু ভুঁইফোড় গ্যাং ব্যাবসায় জাঁকিয়ে বসতে চেষ্টা করলেও কেউই খুব বেশিদিন টেকেনি। তাদের নিত্যনৈমিত্তিক লড়াইয়ে বিরক্ত শহরবাসী ও পুলিশ খেয়ালই করেনি অন্যদিকে জমি দখলের জন্য তৈরি হচ্ছিল সেই তামিল যুবক, যে কিনা আমাদের এই আখ্যানের অন্যতম নায়ক।

১৯২৬ সাল। তামিলনাড়ুর পানানকুলামে এক তামিল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মাস্তান হায়দার মির্জা। সেখান থেকে রোজগারের আশায় বোম্বাই শহরে চলে আসে তার পরিবার। ক্রফোর্ড মার্কেটে একটা ছোটো সাইকেল রিপেয়ারিং-এর দোকান দেয় মাস্তানের বাবা। মাস্তান তখন নেহাতই শিশু। অভাবের সংসারে লেখাপড়া শেখার সুযোগ হয়নি। বাবার দোকানে বসে সে। হাতে-হাতে কাজ শেখে, কাজ করে। দিন গেলে রোজগার যা হয়, তাতে মাস্তানের বাবাকে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়।

কাজের শেষে মাস্তান হেঁটে বাড়ি ফেরে রোজ। মাঝে-মাঝে ঘুরপথে একা হাঁটে সে। দেখে মায়ানগরীর উজ্জ্বল আলো, চাকচিক্য। রাস্তায় তার পাশ দিয়ে ছুটে চলে দামি গাড়ি। অভিজাত এলাকায় বিশাল প্রাসাদোপম সব বাড়ি। টাকা উড়ে বেড়ায় এই শহরে। চারিদিকে বিলাসের কত উপকরণ! সেই আলোর পাশে আর একটা বোম্বাই ঘুমোয় অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে, আধপেটা খেয়ে। সেখানে শুধু অভাব, কান্না, হতাশা। যা কিছু সুন্দর, যা লোভনীয়, তার সবটাই একদল মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। তাদের সেসব পেতে চাওয়ারও অধিকার নেই। মাস্তানের শিশুহৃদয় বিদ্রোহ করে। অপ্রাপ্যের দিকে হাত বাড়াতে চায়।

যে শিশু ভবিষ্যতে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা হবে, সে দারিদ্র্যকে নিয়তি বলে মেনে নেবেই বা কেন! মেনে নেয়নি, ঠিক যেভাবে কয়েক দশক পরে এক হেড কনস্টেবলের দ্বিতীয় সন্তানও বাবা, সমাজ, সর্বোপরি বিধাতার ছকে দেওয়া ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। হয়ে উঠেছিল আঁধার জগতের একচ্ছত্র সম্রাট। তার কাহিনিও শোনাব। তার আগে আসি সেই মানুষটির কথায় যার হাত ধরে সেই পথের সূচনা।

## ।। দুই ।।

# মাস্তানের উত্থান

কয়েক বছর পরের ঘটনা। মাস্তান তখন সদ্য তরুণ, বাবার দোকান ছেড়ে কাজে যোগ দিল বোম্বের ম্যাজাগন ডকে কুলি হিসেবে। বাবা ধার্মিক মুসলমান। দারিদ্র্যকে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছে বলে মেনে নিয়েছেন। সাবধান করলেন ছেলেকে। বললেন, প্রলোভন জয় করে ঈশ্বরের দেখানো পথে চলতে।

কিন্তু যৌবন কবেই বা নির্দেশ, উপদেশের পরোয়া করেছে! আর মাস্তান তো এমনিতেও তার বয়সী বাকি পাঁচজনের মতো সাধারণ নয়। যে ছেলে একদিন সারা বোম্বাই শহরের ওপর নিজের রাজত্ব কায়েম করবে, তার সাধারণ হলে চলবেই বা কেন!

বোম্বাই বন্দরে রোজ কত জাহাজ থামে। মাল ওঠে নামে। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাবসা চলে। কিন্তু কুলিদের অবস্থার উন্নতি হয় না এতটুকু। তাদের কাজ করতে হয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। রোজগারও যথেষ্ট কম। তার ওপর ব্রিটিশ ও ভারতীয় অফিসারদের গালিগালাজ, নিপীড়ন তো আছেই। দাঁতে-দাঁত চেপে কাজ করে চলে মাস্তান। খুঁটিয়ে নজর রাখে চারিদিকে। চিনে নিতে চেষ্টা করে ফাঁকফোকর।

তবে সহ্য করাটা নিতান্তই যে বাহ্যিক ব্যাপার ছিল, তার প্রমাণ মিলল অচিরেই। সেই সময়ে ম্যাজাগন বন্দরের দাদা ছিল শের খান পাঠান নামে একজন। ডকের শ্রমিকদের কোনো সংগঠন ছিল না। সেই সুযোগে তাদের ওপর যথেচ্ছ নির্যাতন চালাত শের খান। মারধর, গালিগালাজ তো ছিলই, উপরন্তু কুলি, শ্রমিকদের সামান্য রোজগারেও ভাগ বসাত লোকটা। কেউ না দিতে চাইলে তার সাঙ্গপাঙ্গরা জোর করে ছিনিয়ে নিত।

মাস্তানও শুরু শুরুতে বাকিদের মতো সহ্য করেছিল। তারপর একদিন সিদ্ধান্ত নিল মুখোমুখি হওয়ার। সে কুলিদের বোঝাল যে তারাও মানুষ। পাঠান যদি গুটিকয় চ্যালা নিয়ে এসে তাদের পেটাতে পারে, তাহলে এতজন শক্তিশালী কুলি, মোট বয়ে বয়ে যাদের হাত লোহার চেয়েও শক্ত, তারা কেন ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না!

কেটে গেল গোটা একটা সপ্তাহ। পরের শুক্রবার যখন 'হফ্তা' আদায় করতে এল শের খানের লোকেরা, মাস্তান আরও দশজন কুলিকে সঙ্গে নিয়ে শের খানের দলে জনাপাঁচেকের ওপর খালিহাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। শের খানের লোকেদের হাতে ছিল লাঠি, রড, রামপুরি চাকু। তবু তারা এঁটে

উঠতে পারল না বেপরোয়া কুলিদের সঙ্গে। প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য হল। জীবনে প্রথমবার জয়ের স্বাদ পেল মাস্তান। সেই একটি ঘটনা তাকে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিল।

এর মধ্যে কেটে গেছে বছর তিনেক। মাস্তান বুদ্ধিমান। ডকের কাজের ঘাঁত-ঘোঁত বুঝে নিয়েছে সে। লক্ষ করেছে, আমদানিকৃত জিনিসের ওপর যদি ট্যাক্স দিতে না হয়, তাহলে লাভের অংশ একলাফে বেড়ে যায় অনেকটাই। জিনিসপত্র কাস্টমসে চালান না করলে ট্যাক্সেরও প্রশ্ন আসে না। এর মধ্যে অন্যায় কিছু দেখে না মাস্তান। তার যুক্তি খুব পরিষ্কার। এক পক্ষ বিক্রি করবে, অন্য পক্ষ কিনবে। দু'জনেরই ব্যাবসা। পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করতে হয়। সেই টাকার ভাগ খামোখা সে সরকারকে দিতে যাবে কেন!

এরপর মাস্তান নজর রাখতে শুরু করল। ফিলিপ্স ঘড়ি, ট্রানজিস্টর, অন্যান্য ইলেকট্রনিকস আইটেম, সোনা-রুপো এরকম বেশ কিছু জিনিসে শুল্কের হার বেশ চড়া ছিল। সেগুলির বাজারে চাহিদাও ছিল খুব বেশি। মাস্তান তার পথ খুঁজে পেল। সে বুঝে গেল, বাজারের থেকে কম দামে যদি সে ওইসমস্ত জিনিস আমদানি করতে পারে, তবে প্রচুর মুনাফা উপার্জন করা সম্ভব হবে।

যেমন ভাবা, তেমনই কাজ। মাস্তান কাস্টমসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জিনিস আমদানির নানান ফিকির খুঁজতে লাগল। মুম্বই পুলিশের রিটায়ার্ড এসিপি ইশাক বাগোয়ান পরবর্তীকালে নিজের বইতে লিখেছেন, "যারা হজ থেকে ফিরত, ট্রানজিস্টর, ঘড়ির মতো দামি ইলেকট্রনিকস আইটেম সঙ্গে করে আনত। কেউ কেউ আবার সোনার বিস্কিটও নিয়ে আসত। মাস্তান তাদের সেইসব জিনিস জামাকাপড়, হ্যান্ডব্যাগ, অন্তর্বাসের মধ্যে করে লুকিয়ে বন্দর থেকে বের করে আনতে সাহায্য করত। তার জন্য যথেষ্ট পুরস্কারও মিলত।"

মাসখানেকের মধ্যেই মাস্তানের আয় পনেরো টাকা থেকে বেড়ে পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেল। সে-যুগে স্মাগলিং ব্যাপারটা খুব বেশি প্রচলিত ছিল না। এভাবে যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করা সম্ভব সেটা কারও ধারণাতে আসেনি। মাস্তানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়ছিল। সেই সময় আর একটা ঘটনা ঘটল। শেখ গালিব নামে এক আরব ব্যবসায়ী বোম্বে ডকের মাধ্যমে অবৈধ চোরাচালান চালাত। কিন্তু ডকের ভেতরের লোকের সঙ্গে বোঝাপড়া না থাকলে এই ব্যাবসা বাইরে থেকে চালানো কঠিন। রতনে রতন চেনে। মাস্তান, গালিবের হয়ে কাজ করতে শুরু করল। রোজগার বাড়তে লাগল। মাস্তানের বুদ্ধি ও কর্মপটুতায় খুশি গালিব তাকে দশ শতাংশের অংশীদার করে নেয়।

১৯৫০ সালে মোরারজি দেশাই বোম্বের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। তাতে ফল হল উলটো। পাড়ায়-পাড়ায় লুকিয়ে

চলতে লাগল 'আন্টি জয়েন্ট', যাতে মহিলারা নিজেদের বাড়িতে বানানো লিকার সরবরাহ করত খদ্দেরদের। মাফিয়াচক্র অবৈধ পানীয় ব্ল্যাক মার্কেটে চড়া দামে বিক্রি করে আরও বেশি মুনাফা কামাতে শুরু করল। গালিব ও মাস্তানও রোজগারের নতুন পথ খুঁজে পেল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে টাকা জমিয়ে ফেলল। মাস্তান নিজের বাড়ি কিনল। কিনে ফেলল সাইকেলও। সে-যুগে সাইকেল কেনা সাধারণ মধ্যবিত্তদের কাছে যথেষ্ট গর্বের ব্যাপার ছিল।

কিন্তু সুসময় চিরদিন স্থায়ী হয় না। এরই মাঝে একদিন হঠাৎই গ্রেফতার হল গালিব। ঠিক সেই সময়েই গালিবের একটি সোনার বিস্কিটের চালান মাস্তানের হাতে আসে। গালিব তখন জেলে। মাস্তান সেই চালান নিজের কাছে রেখে দিল। এর পরের ঘটনার বিবরণ আমরা মাস্তানের দত্তক পুত্র সুন্দর শেখরের বর্ণনায় পাই—

"একজন (গালিব) আমার বাবার সাহায্যে সোনার বিস্কিট স্মাগ্‌ল করে আনছিল। কিন্তু সেই সময়েই লোকটি অ্যারেস্ট হয়। আমার বাবা সোনার বিস্কিটগুলি নিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। তিন বছর জেল খাটার পর সেই লোকটি বেরিয়ে এলে আমার বাবা সব সোনা তাকে ফেরত দেন। সেই ব্যক্তি এর পরে আর আমার বাবা ছাড়া কারও সঙ্গে ব্যাবসা করেননি।"

এরপর পাঁচের দশকের মাঝামাঝি মাস্তানের সঙ্গে আলাপ হয় দামানের এক ব্যবসায়ী সুকুর নারায়ণ ভাটিয়ার। ভাটিয়া প্রাক-জীবনে ছিল একজন সাধারণ জেলে। সমুদ্রপথে মাছ-ধরা ট্রলিতে করে স্মাগলিং-এর সহজ পন্থা খুঁজে নিয়েছিল সুকুর। মাস্তান তার অবৈধ ব্যাবসায় সঙ্গী হয়। দু'জনে একসঙ্গে দুবাই ও আডেন থেকে সোনা ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী স্মাগল করে আনতে থাকে এ-দেশে। রাতারাতি ফুলেফেঁপে ওঠে মাস্তানের ব্যাবসা। মাস্তানের বিজয় অভিযানের অশ্বমেধের ঘোড়া বীরদর্পে ছুটে চলে বোম্বাইয়ের অন্ধকার দুনিয়ার পথ ধরে। সেই ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরার মতো শক্তিশালী কেউ ছিল না সে-সময়ে। মাস্তানের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ঠিক কতটা ছিল, তা বোঝাতে সুন্দর শেখরের একই বাক্যই যথেষ্ট—

"সঞ্জয় গান্ধি মুম্বইয়ে এলে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে ভোলেননি কোনোদিন।"

শুধু রাজনীতিগত যোগাযোগই নয়, মাস্তান ছিল আনখশির চলচ্চিত্রপ্রেমী। মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তার প্রতিপত্তি ছিল অসীম। বেশিরভাগ ফিল্ম পার্টিতে তাকে দেখা যেত। অভিনেত্রী মধুবালার অনুরাগী ছিল মাস্তান। বিয়েও করেছিল তৎকালীন এক স্বল্পখ্যাত অভিনেত্রী শাহেজাহান বেগম ওরফে সোনাকে, যার সঙ্গে মধুবালার চেহারায় অনেকটাই সাদৃশ্য ছিল। সাদা শার্ট-

ট্রাউজার পরিহিত দীর্ঘদেহী মাস্তানকে চিনত না এমন মানুষ মুম্বইতে অন্তত দুর্লভ ছিল। সুপারহিট ছবি দিওয়ার-এ অমিতাভ বচ্চনের চরিত্রটি খানিকটা মাস্তানের আদলে তৈরি হয়েছিল। এ-ছাড়া 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন মুম্বই' ছবিটি মাস্তানের বায়োপিক বলা যেতে পারে, যেখানে অজয় দেবগন মাস্তানের চরিত্রে অভিনয় করেন।

আজ মাস্তানকে নিয়ে লিখতে বসে মনে হচ্ছে, শুধু তাকে নিয়েই একটা আস্ত বই লিখে ফেলা যায়। এত বিচিত্র জীবন, এত কর্মকাণ্ড, এত রঙ, আলো-ছায়া এই সামান্য পরিসরে লিখে ফেলা অসম্ভব। আশ্চর্য একজন মানুষ, যার ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি হয়তো সাধারণের চেয়ে আলাদা। তবে সেখানেও কিছু সীমারেখা ছিল। ছিল পরিমিতিবোধ, যা পরবর্তীকালের মাফিয়া ডনদের মধ্যে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হাজি মস্তান কেন বাকিদের চেয়ে আলাদা, তা বোধহয় একটি ব্যাপার থেকেই স্পষ্ট হয়। দীর্ঘ বছর অপরাধ-জগতের অলিন্দে বিচরণ করা দুর্ধর্ষ ডন হাজি মাস্তান কোনোদিন বন্দুক তাক করেনি কারও দিকে। সারা জীবনে একজন মানুষকেও হত্যা করেনি। তার সম্পর্কে লিখতে গেলে ইতিহাস লেখা যায়। কিন্তু এই বইয়ের পরিসর তার অনুমতি দেয় না। তাই বাকি রয়ে গেল প্রায় সবটাই। হয়তো কোনোদিন আবার লিখব তার কথা। লিখে ফেলব যা কিছু লেখা হল না তার সবটুকু। যাই হোক, যা বলছিলাম, তাতে ফিরি আপাতত।

সময় বয়ে চলেছিল আপন গতিতে। ততদিনে আরও অনেক ছোটো বড়ো মাফিয়ারা তাদের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করছিল বোম্বে শহরে। শুরু হয়েছিল, যথেচ্ছ রক্তপাত, হিংসা। এদের সকলের চেয়ে মাস্তান ছিল আলাদা। প্রচুর দান-ধ্যান করত সে। মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে দেখা যেত মাস্তানকে। কোনোদিন কোনো ধরনের নারকোটিক স্মাগ্‌ল করেনি কারণ, সে মনে করত শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য যুবসমাজকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিলে ঈশ্বর তাকে কোনোদিন ক্ষমা করবেন না।

মাস্তান নিজেকে কখনও অপরাধী বলে মনে করেনি। বরং তার কাছে তার কাজ ছিল আর পাঁচটা ব্যাবসার মতো একটা ব্যাবসা। বুদ্ধিমান মাস্তান জানত, সুষ্ঠুভাবে ব্যাবসা চালাতে গেলে অযথা শক্তিক্ষয় করা বোকামি। তাই সমকালীন অন্যান্য ডনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলত সে। সেইসব সম্পর্ক সবক্ষেত্রে শুধু সামাজিক ছিল না, কিছু ক্ষেত্রে তা ছিল পুরোদস্তুর ব্যবসায়িক। যারা তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারত, তাদের মাস্তান নিজের বন্ধু তথা ব্যাবসায় অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিল। ফলে প্রতিযোগিতা শুধু কমে আসেনি, সব পক্ষই শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিল।

সেই কারণেই হয়তো বোম্বাই পুলিশের পক্ষে তাদের স্পর্শ করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আর শুধু তাই তো নয়, সেই যুগে পুলিশের চাকরিতে বেতন খুব বেশি ছিল না। বেশিরভাগ পুলিশকর্মীদের সংসার চলত এইসব ডনদের থেকে পাওয়া 'উপরি'-র ওপর নির্ভর করে। ফলে তারাও এসব অবৈধ ব্যাবসায় যথাসম্ভব সাহায্য করত। এইসব কারণেই মাস্তানের ক্ষমতা আকাশ ছুঁয়েছিল। সমাজের ওপরতলায় ছিল তার যথেচ্ছ বিচরণ। একাধিকবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রস্তাব সত্ত্বেও নিজে রাজনীতিতে আসেনি মাস্তান। ধারণা করা যেতে পারে, এ-ও মাস্তানের বিচক্ষণতার পরচায়ক। কারণ সে জানত, কোনো বিশেষ দলকে সমর্থণ করলে অন্য দল তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তাদের দিক থেকে মাস্তানের বিপদ তৈরি হবে। সেই কারণে সব দলের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলত সে।

মাস্তান নিজেকে সাচ্চা মুসলমান বলে মনে করত। পুত্রসন্তানের কামনায় অসংখ্যবার হজযাত্রা করেছিল সে। কিন্তু সেই ইচ্ছে অধরাই রয়ে গেছিল তার। যৌবনের শুরুতে বাবার উপদেশ বৃদ্ধ বয়সেও মনে রেখেছিল মাস্তান হায়দার মির্জা, যাকে দুনিয়া চিনেছিল 'হাজি মাস্তান' নামে।